Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 1, January-June 2019
ISSN 2519-5816

পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর ভূমিকা

মোছা. রূপালী খাতুন*

Abstract: Because of the Bengali Renaissance, a positive change in the attitude towards women developed in the nineteenth century. During this time, Nawab Faizunnesa Chowdhurani established a Girl's School in Kandirpar area of Cumilla with the intension to spread education among Muslim women. She beared all the expenses of the school from the earnings of her own Jamindari. As a strict purdah system was prevailing in the society, the Muslim women were not interested to study in this school at first. However, a change occurred in very short time due to her tireless efforts. The women's education initiative of Nawab Faizunnesa had a unique contribution towards the women's education and creating women's awareness in Bengal.

ভূমিকা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাঙালি মুসলমানদের এক ক্রান্তিলগ্নে পূর্ব বাংলার কুমিল্লা জেলার পশ্চিমগাঁও গ্রামে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর[১] (১৮৩৪-১৯০৩) আবির্ভাব ঘটে। তৎকালে বাঙালি মুসলমানরা ব্রিটিশদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আবার ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় তারা শিক্ষাদীক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে উনিশ শতকে বাংলায় হিন্দু সমাজে যে জাগরণ শুরু হয় তার স্পর্শ মুসলমানদেরকে আন্দোলিত করতে অনেকটা সময় লেগে যায়। এ শতকের শেষ দিকে এসে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। আর এসময় ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী কুমিল্লা জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি শুধু মেয়েদের জন্যই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেননি, ছেলেদের জন্যও বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি সমাজসেবা ও সাহিত্য চর্চায় তৎকালে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর সাহিত্যচর্চা তথা লেখনী তৎকালীন নারীসমাজের জাগরণে ও বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে মেয়েদেরকে মুক্ত করে আলোর পথ প্রদর্শনে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য প্রবন্ধে পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি রচনায় মানবিকবিদ্যা গবেষণায় ব্যবহৃত ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে নবাব ফয়জুন্নেছা রচিত সাহিত্যকর্ম এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রাথমিক উৎস অনুসন্ধান ও পর্যালোচনাসহ আধুনিক গবেষকদের লেখনীর সহায়তাও নেওয়া হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা থেকে পাঠক ও গবেষক পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষার বিস্তারে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতার ইতিবৃত্ত এবং এতদাঞ্চলের শিক্ষা বিস্তার ও বিকাশে বিশেষ করে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সাধনে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঐতিহাসিক পটভূমি

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলা স্বাধীনতা হারায়। পরবর্তীতে ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিওয়ানি লাভের পর থেকে বাংলার মুসলমানদের জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। অর্থনৈতিকভাবে মুসলমানরা সর্বস্বান্ত হওয়ার পাশাপাশি ব্রিটিশ প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনীহা থাকায় তারা শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। অথচ হিন্দু সম্প্রদায় এসময় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষাদীক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে যায়। তবে এ অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয় উনিশ শতকের শেষে এসে। বাংলায় হিন্দু সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণে মুসলমানরা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের অধঃপতন সম্পর্কে সচেতন হওয়া শুরু করে। এ সময় মুসলমানরা শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)। তিনি সর্বপ্রথম ভারতীয় মুসলমানদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৮৭৫ সালে আলীগড়ে *শমীউল্লা হাইস্কুলে এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ* শুরু করেন। পরবর্তীতে নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৬-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৯) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব শিক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা মুসলমানদের শতবর্ষ পূর্বের চিন্তাধারা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। এ সকল মনীষীদের সমপর্যায়ের তৎকালীন নারীশিক্ষা বিস্তার ও নারীজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী।[২]

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় মেয়েদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে ইউরোপ থেকে আগত খ্রিস্টান মিশনারিরা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিরা। তারা আঠারো শতকের শেষভাগে এদেশে বসবাসরত *বেঙ্গল আর্মি* ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারির সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য ১৭৮২ সালে খিদিরপুরে *আপার অরফ্যান স্কুল* ও আলিপুরে *লোয়ার অরফ্যান স্কুল* নামে দুটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।[৩] এ দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্ন পরিবারের কিছু বাঙালি মেয়েরা শিক্ষা লাভ করে। ১৮৮৭ সালে একজন সুইডিস মিশনারি কলকাতায় মেয়েদের জন্য প্রথম একটি স্কুলের বালিকা শাখা খোলেন।[৪] এরপর থেকে ক্রমাগত কলকাতা এবং আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় মিশনারিরা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে থাকে, যেখানে বাঙালি মেয়েরা পড়াশুনা শুরু করে। তবে এসব স্কুলের কারিকুলাম খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কিত হওয়ায় মুসলিম পরিবারগুলি তাদের মেয়েদেরকে এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণে প্রেরণ করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে।[৫]

উনিশ শতকে বাংলায় মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান লক্ষণীয়। ১৮২৪ সালের মধ্যে তারা শ্রীরামপুরে ১৩টি, বীরভুমে ৭টি, ঢাকায় ৫টি এবং চট্টগ্রামে ৩টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।[৬] ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ মিস মেরী অ্যান কুক এর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮২৭ সালে 'নারী সংঘ' নামক একটি মিশনারি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে ১৬০ জন বালিকা পড়াশুনা করে এবং এদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান।[৭] ১৮২৮ সালে *মিশনারি ইনটেলিজেনস পত্রিকা* থেকে জানা যায় যে, পূর্ব বাংলার যশোর জেলা জজ এইচ. এম লিগুর স্ত্রী মিসেস লিগু নিজের টাকায় যশোরে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রতিদিন দু'ঘন্টা করে তিনি মেয়েদের সেলাই শেখাতেন।[৮] উল্লেখ্য শ্রীরামপুর মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলিম মেয়েরা পড়তো বলে সহজেই অনুমান করা যায়। তবে এসব বিদ্যালয় অর্থের অভাবে ১৮৩৮ সালের মধ্যে অধিকাংশই বন্ধ হয়ে যায়।[৯] ১৮৬০ সালে পূর্ব বাংলায় ময়মনসিংহে *আলেকজান্ডার ডাফ গার্লস স্কুল* প্রতিষ্ঠিত হয়[১০], প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তিতে *বিদ্যাময়ী স্কুল* নামে পরিচিত হয় যা আজও বর্তমান। ১৮৬৩ সালের ১১ মে ১৬ জন ছাত্রী নিয়ে ঢাকার সূত্রাপুরে প্রথম সরকারি *নর্মাল বালিকা বিদ্যালয়* প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১] তবে এখানে মুসলিম

ছাত্রীদের পড়ার সুযোগ ছিল না। স্কুলটি ১৮৭২ সালে বন্ধ হয়ে যায় এবং বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ১৭ জন মেয়ে এখান থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বলে জানা যায়।[১২] পূর্ববাংলায় নারী শিক্ষা বিস্তারে ১৮৬৩ সালে পাবনায় বামা সুন্দরী একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এখানে হিন্দু-মুসলিম মেয়েরা পড়তো বলে জানা যায়।[১৩] অন্যদিকে ১৮৬৩ সালে ঢাকায় ৩টি *বালিকা বিদ্যালয়* ও একটি *যুবতি বিদ্যালয়* ছিল। *যুবতি বিদ্যালয়টি* পরবর্তিতে *বাংলাবাজার গার্লস স্কুল* নামে পরিচিত হয়।[১৪] উল্লেখ্য পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে ব্রাহ্ম সমাজের অবদান অতুলনীয়। ১৮৭৩ সালে ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের পড়াশুনার জন্য *শুভসাধিনী সভার* পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মিস মেরি কার্পেন্টার এই বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে এসে ঢাকায় অনুরূপ আরো একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করায় ব্রাহ্ম সমাজের কর্মীরা ঢাকায় আরেকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পসময়ের মধ্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দু'টি একত্রিত হয়ে *ঢাকা ফিমেল স্কুল* বা *ইডেন ফিমেল স্কুল* নামে অভিহিত হয়।[১৫]

পূর্ব বাংলার মুসলিম নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কুমিল্লা জেলার পশ্চিমগাঁও এর জমিদার[১৬] নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী। তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কঠোর পর্দাপ্রথার বেড়াজালে অবস্থান করেও ফয়জুন্নেছা উপলব্ধি করেন নারীর জন্য আধুনিক শিক্ষা ব্যতিত দেশবাসীর সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। কুমিল্লা শহরে মেয়েদের জন্য তিনি পৃথকভাবে দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একটি কুমিল্লার নানুয়াদিঘির পশ্চিমপাড়ে (পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়টি অন্য একজন নারীর নামে *শৈলরাণী বালিকা বিদ্যালয়* নামকরণ হয়েছে[১৭]) এবং ১৮৭৩ সালে কান্দিরপাড়ে আরেকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়টির সাথে ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা করা হয় এবং ছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়।[১৮] নবাব ফয়জুন্নেছা বোরকা পরে পালকিতে চড়ে ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদেরকে তাঁর বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য অভিভাবকবৃন্দকে অনুরোধ করতেন।[১৯] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টি ভারত উপমহাদেশে মুসলিম নারীশিক্ষার জন্য স্থাপিত প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠান। তাই পূর্ব বাংলার মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যালয়টি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। ১৮৮০-৮১ সালের সরকারি শিক্ষা প্রতিবেদনে বিদ্যালয়টি 'The best girls School' (ইডেন ফিমেল স্কুল ব্যতিত) বলে প্রশাংসনীয় হয়।[২০] ১৮৮৯ সালে তিনি স্কুলটিকে *জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়* (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) উন্নীত করেন।[২১] প্রথম দিকে এখানে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ফয়জুন্নেছার মৃত্যুর অনেক পরে আনুমানিক ১৯৩১ সালে বিদ্যালয়টিতে ইংরেজি মাধ্যমে ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান করা শুরু হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।[২২]

উল্লেখ্য মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথমাবস্থায় কোন মুসলিম মেয়ে পড়তো কিনা তার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা অধিক পরিমাণে এখানে পড়াশুনা করতো।[২৩] তবে সরকারি এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৮৭৭-৭৮ সালে ত্রিপুরা জেলায় ছয়জন ছাত্রী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তাদের মধ্যে একজন ছিল মুসলমান কৃষক পরিবারের সন্তান।[২৪] তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার মধ্যে কুমিল্লাতেই মুসলিম নারীশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় তাই *ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ে* মুসলিম ছাত্রীর উপস্থিতি অস্বাভাবিক ছিল না।[২৫] অন্যদিকে ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টির নামকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠানটি 'ফয়জুন্নেছা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়' হিসেবে কুমিল্লার বুকে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে এটি সরকারিকরণের মাধ্যমে নামকরণ হয় *ফয়জুন্নেছা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়*।[২৬]

আরো পরে 'নবাব ফয়জুন্নেছা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট' (১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত) এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকারের অনুমতিক্রমে প্রতিষ্ঠানটির নামের সাথে 'নবাব' শব্দটি সংযুক্ত হয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে 'নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়'।[২৭] তৎকালীন সমাজের নিম্নস্তরের বাংলা ভাষাভাষীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন, যা উনিশ শতকে পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীর প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমে ফয়জুন্নেছার এক অনন্য কীর্তি।[২৮] বর্তমান সময়েও বিদ্যালয়টি কুমিল্লায় নারীশিক্ষা বিস্তারে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে।[২৯]

মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী তাঁর জমিদারির বেশ কয়েকটি মৌজা যেমন- ভাউকসার, ভাটরা, ছাতার পাইয়া, মানিকমুড়া এবং বাংগড্ডায় ছেলেদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩০] এছাড়া পশ্চিমগাঁওয়ে *নবাব ফয়জুন্নেছা ও বদরুন্নেছা হাইস্কুল* নামে (*N.F & B.N High School*) যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে সেখানেও ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর অবদান রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর পারিবারিক একটি 'টোল' (ছোট পরিসরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ছিল যা পরবর্তীতে অনাকাংখিত ভাবে অগুনে পুড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শিক্ষাব্রতী ফয়জুন্নেছার পক্ষে উক্ত টোলটির ধ্বংস মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। তিনি টোলটি টিকিয়ে রাখার জন্য কন্যা বদরুন্নেছাকে অনুরোধ জানান। মাতার উৎসাহে বদরুন্নেছা ৯৫ ডেসিমেল জমি দান করে পুরাতন টোলটি নতুন করে সংস্কার করে *মাধ্যমিক ইংরেজি বিদ্যালয়ে* পরিণত করেন। পরবর্তীকালে ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* এর অধীনে *উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে* পরিণত হয় এবং প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে 'বদরুন্নেছা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়' নামকরণ হয়।[৩১] এই প্রতিষ্ঠানটি আজও পশ্চিমগাঁওয়ে বিদ্যমান থেকে হাজার হাজার স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের আলো দান করছে। এছাড়া ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী স্থানীয় শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে মাদ্রাসাটি পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন।

এই মাদ্রসার ব্যয়ের হিসাবের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ:

মাদ্রাসা ব্যয়	মাসিক	বাৎসরিক
মৌলবী	১২	১৪৪টাকা
কোরান শরীফ, দরুদ দিনে হাজার বার পড়নকারি মোল্লা	৬	৭২টাকা
তালেব এলেমগণের লেখাপড়া করার রাত্রিকালিন আলো জ্বালানোর তেল বাবদ	১/১০	৯ টাকা
মোট=	১৮ ১/১০	২২৫ টাকা

সূত্র : নবাব শ্রীমতি ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী : *ওয়াকফানামা*, পৃ. ১২

উল্লেখ্য এই মাদ্রাসাটি পরবর্তীকালে (১৯৪৩ সালে) *নওয়াব ফয়জুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিক কলেজে* রূপান্তরিত হয়।[৩২] অন্যদিকে একইসাথে পুরাতন মাদ্রাসাটি সে সময়ে গাজীমুড়া নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয় এবং নামকরণ হয় *গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসা*।[৩৩] অদ্যাবধি উক্ত মাদ্রাসাটি কুমিল্লায় ধর্মীয় জ্ঞান বিতরণ করে চলেছে। অন্যদিকে *নওয়াব ফয়জুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিক কলেজটি* ১৯৬৫ সালে ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত হয়।[৩৪] এছাড়া ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী পশ্চিমগাঁওয়ে নিজ বাসভবনের পাশে দশ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ স্থাপন করেন। এখানে দীন-ইসলামের আলোচনা চলতো এবং স্থানীয়দের কোরআন শিক্ষা দেয়া হতো। অপূর্ব সুন্দর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে নির্মিত মসজিদটি জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় আজও বিদ্যমান রয়েছে।[৩৫] নবাব ফয়জুন্নেছা মেয়েদের

চিকিৎসার জন্য কুমিল্লায় একটি *জেনানা হাসপাতাল* নির্মাণ করিয়েছিলেন।[৩৬] তিনি দূর-দূরান্ত থেকে দেশ-বিদেশে যাতায়াতের সময় পরিশ্রান্ত ব্যক্তি এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সেবার উদ্দেশ্যে নিজ বাড়িতে বিরাট একটি মুসাফিরখানা স্থাপন করেন। যে কোন মুসাফির সেখানে নির্ভাবনায় আশ্রয় নিতে পারতো। এমনকি ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী পবিত্র মক্কায় হজ্ব পালন করতে গিয়ে নিজ অর্থ ব্যয়ে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া *নহরে জোবায়দা* খালটি পুনঃখনন করিয়েছিলেন।[৩৭]

উনিশ শতকে মুসলিম নারী সাহিত্যিক হিসেবেও ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৭৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা গিরিশ মুদ্রণযন্ত্র থেকে ফয়জুন্নেছা রচিত আত্মজীবনীমূলক সাহিত্যগ্রন্থ 'রূপজালাল' প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নারী গ্রন্থকর্ত্রী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৩৮] এ কাব্যগ্রন্থে তিনি নারীর রূপের বর্ণনার পাশাপাশি মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করেছেন। ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী 'সংগীত সার' ও 'সংগীত লহরী' নামে আরো দু'খানা গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থ দু'টির কোন মুদ্রিত কপি বা অখণ্ড পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না।[৩৯]

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে ফয়জুন্নেছার বিদ্যালয়ের পরই *ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর* অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা কলেজের কতিপয় ছাত্রের উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এই সংগঠনটি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারকে মূল কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে সফলতা অর্জন করে।[৪০] পর্দাপ্রথার কঠোরতার কারণে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষাদান অসম্ভব ভেবে এই সাম্মিলনী গৃহশিক্ষাকে অবলম্বন করে ছাত্রীদেরকে গৃহশিক্ষক দ্বারা গৃহপারমণ্ডলে পড়ানো এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে। উল্লেখ্য সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরের বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৪ জন পরীক্ষার্থী সফলতা লাভ করেন এবং তারা সকলেই ছিলেন মুসলিম পরিবারের কন্যা সন্তান।[৪১] এভাবে পূর্ব বাংলায় মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর বালিকা বিদ্যালয়ের পরই ছিল *ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর* অবস্থান।[৪২] অন্যদিকে ১৮৯৭ সালের ১৯ জানুয়ারী কলকাতায় মুসলিম মেয়েদের জন্য *মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা* স্থাপিত হয়। মুর্শিদাবাদের জমিদার নওয়াব শামসি জাহান ফেরদাউস মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় ২৫ জন ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়।[৪৩] ১৯০৩ সালের একটি জরিপে দেখা যায় সমগ্র বাংলায় ১,০০,৩২২ জন বালিকা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে, তার মধ্যে মাত্র ১% ছাত্রী ছিল মুসলমান। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত সর্বমোট ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮১৬ জন, এর মধ্যে ৪৩৯ জন হিন্দু, ৫ জন মুসলমান, ২৮৬ জন দেশীয় খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ৮৯ জন।[৪৪] ১৮৮১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত *বামাবোধিনী পত্রিকায়* শুধু কলকাতার নারীশিক্ষার একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়-

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১
হিন্দু	৬%	৭%	৯%
মুসলিম	১%	১%	৩%
খ্রিস্টান	৭%	৭%	৭%
ব্রাহ্ম	৬৪%	৬৫%	৫৩%
বৌদ্ধ	১২%	২৫%	১৫%

সূত্র : *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ৪৭৭ সংখ্যা, মে-জুন, ১৯০৩, পৃ. ৮

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শুধু পূর্ব বাংলা নয় বরং কলকাতা থেকে শুরু করে সমগ্র বাংলায় উনিশ শতকে মুসলিম নারীশিক্ষার হার ছিল অত্যন্ত নগন্য। বিশ শতকের

শুরু থেকে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯১১ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮৮-১৯৩২) মুসলিম সমাজের তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে[৪৫] কলকাতায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। ফলে বিশ শতকের প্রারম্ভ হতে পরবর্তী সময়ে বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা বিস্তারে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বালিকা বিদ্যালয়টি মাইলফলক হিসেবে কাজ করে।

গুরুত্ব ও ফলাফল

নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী কর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিশেষ করে মুসলিম নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মেয়েদের জন্য কঠোর পর্দাপ্রথা ও অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকায় বাঙালি নারী সার্বিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে। ঠিক এমন একটি সময়ে ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উল্লেখ্য ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একই বছরে ঢাকায় *ইডেন ফিমেল স্কুল* প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে *ইডেন ফিমেল স্কুলটি* ব্রাহ্মসমাজের পুরুষ প্রতিনিধিরা প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষেত্রে কুমিল্লার মত প্রত্যন্ত জনপদে একজন নারী কর্তৃক নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন একটি দুঃসাহসিক কার্যক্রম বটে। *ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়টি* পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে যে অনন্য ভূমিকা রেখেছে তা অনস্বীকার্য। প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে হিন্দু মেয়েরা এখানে বিদ্যার্জন করলেও অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম পরিবারের মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে। ধীরে ধীরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। *ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের* ছাত্রীদের মধ্য থেকে পরবর্তীতে অনেক মহীয়সী নারীর জন্ম হয়, যারা পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে এবং নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। এ প্রতিষ্ঠানটি আজও 'নবাব ফয়জুন্নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' হিসেবে কুমিল্লায় নারীশিক্ষা প্রসারে নিরলসভাবে জ্ঞানের আলো বিতরণে ভূমিকা রেখে চলেছে।

উপসংহার

উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজ ছিল রাজনৈতিক ভাবে নিষ্পেষিত, অর্থনৈতিকভাবে পর্যদুস্ত, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং নানাবিধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক সমাজ। পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কঠোর অবরোধপ্রথা ও পর্দাপ্রথার বেড়াজালে নারীর অবস্থা ছিল আরো করুণ। অন্যদিকে উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলমানদের পূনর্জাগরণে যে সকল নেতার আবির্ভাব হয় তারা পুরুষ সমাজের অবস্থার পরিবর্তনেই বেশি তৎপর ছিলেন, নারী সম্পর্কে তাদের ভাবনা ছিল অতি নগন্য। এরূপ পরিস্থিতিতে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর আবির্ভাব তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুসলিম নারীসমাজের জন্য আর্শীবাদ স্বরূপ ছিল। ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যা উপেক্ষা করে তিনি মুসলিম নারীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নবাব ফয়জুন্নেছার বিদ্যালয় তৎকালে নারীশিক্ষা বিস্তারে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে তাঁর কাব্যপ্রতিভা তৎকালীন পুরুষ সাহিত্যিকদের সমকক্ষতা অর্জনে এবং পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। এছাড়া তিনি নানামুখী জনকল্যাণ মুলক কাজ করেন। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর নারীশিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর এ সকল অবদানের জন্য ব্রিটিশ মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক 'নবাব' খেতাব প্রাপ্ত হন। তিনি বাংলার প্রথম এবং শেষ নারী নবাব।[৪৬]

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী ১৮৩৪ সালে কুমিল্লা (তৎকালীন ত্রিপুরা) জেলার পশ্চিমগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আহমদ আলী চৌধুরী এবং মাতা আফরান্নেছা। জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ফয়জুন্নেছা বাল্যকালে গৃহ শিক্ষক উস্তাদ তাজউদ্দিন সাহেবের নিকট আরবী, ফারসী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি বিচক্ষণ মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। ১৮৬০-৬১ সালে ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার প্রতাপশালী জমিদার মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি।

২. রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৯৭

৩. তপতী বসু, "বাঙালী মেয়েদের লেখাপড়া", *শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ২২৮

৪. Amitabha Mukherjee, *Reform and Regeneration in Bengal, 1774-1823* (Calcutta: Rabindra Bharati University, 1968), p. 15

৫. Shahanara Hussain, "Glimpses in the Condition of Bengali Muslim Women During the Later Half of the Nineteenth Century: A Study Based on the *Bamabodhini Patrika", The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, vol- 3 (Rajshahi : Institute of Bangladesh Studies, 1978), p. 2

৬. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯

৭. যোগেশ চন্দ্র বাগল, *বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ১৮০০-১৯৫৬* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫০), পৃ. ১৫

৮. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস* (ঢাকা: দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১), পৃ. ১৫

৯. Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal : 1876-1939* (E.J Brill: Lieden, 1996), p. 145

১০. আরিফা সুলতানা, "উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৫-২৬, বর্ষ ১৪০৫-১৪০৮/১৯৯৮-২০০১, পৃ. ১৩৬-৩৭

১১. Sharif Uddin Ahmed, *Dhaka : A Study in Urban History and Development* 1840-1921 (Dhaka: Academic Press and Publishers, 1986), p. 79

১২. সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, অনুবাদ: পাপড়ীন নাহার (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০২), পৃ. ১০৮

১৩. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩

১৪. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫

১৫. এই বিদ্যালয়টি ১৮৭৮ সালে তৎকালীন গভর্ণর স্যার অ্যাশলে ইডেনের নামানুসারে 'ইডেন গার্লস স্কুল' নামে সরকারিকরণ হয়।

১৬. তদানীন্তন ত্রিপুরা (বর্তমানে কুমিল্লা) জেলার ১৪০৮৭৪ একর ভূমিতে এবং তৎকালে ৫৫২টি গ্রাম বিশিষ্ট এক সমৃদ্ধশালী পরগণা হোমনাবাদ। নবাব ফয়জুন্নেছা ছিলেন সেই পরগণার অন্যতম প্রধান জমিদার, Homnabad No. 08 Villages- 552, Acres- 140874, Decimal: 38 Square Miles 220, Robert B. Smart, E.S.Q. (Revenue Serveyor, *First of Northern Divisions Lower Provinces : Geographical and Statistical Report on the District of Tippera*, Calcutta, Bengal Secretariat Office, 1866, p. 15)

১৭. আনুমানিক ১৯৩০ সালের দিকে স্থানীয় জনৈক শৈলরাণী দেবীর স্বামী তখন কুমিল্লার আয়কর বিভাগের আইনবিদ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গোপনে মাত্র দশ হাজার টাকার বিনিময়ে ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করে নিজ স্ত্রীর নামে নামকরণ করতে সক্ষম হন। রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

১৮. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬
১৯. পূরবী বসু, *বাংলার স্মরণীয় নারী* (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০১৬), পৃ. ১০৪
২০. *General Report on Public Instruction in Bengal, 1880-81,* Calcutta, 1881, p. 85
২১. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯
২২. *পূর্বোক্ত*
২৩. সোনিয়া নিশাত আমিন, "নারী ও সমাজ" সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস), (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৬৫৯
২৪. *General Report on Public Instruction in Bengal, 1877-78,* Calcutta, 1878, p. 81
২৫. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার (*ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ৫৩৫
২৬. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*
২৭. 'নবাব' শব্দটি সংযোজন পূর্বক বিদ্যালয়টির নাম 'নবাব ফয়জুন্নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' নামকরণের অনুমোদন সংক্রান্ত মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা, বিজ্ঞপ্তিপত্র, স্মারক ৪৮১(১৪), তাং-২২/১২/২০০১। রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*
২৮. *পূর্বোক্ত*
২৯. সোনিয়া নিশাত আমিন, "নারী ও সমাজ" সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৭০৪-১৯৭১*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫
৩০. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭
৩১. *পূর্বোক্ত*
৩২. এ. এইচ. এম. মহিউদ্দিন, "নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মোতওয়াল্লী আলহাজ্ব ছৈয়দ ছেরাজুল হক", *স্ফুরণ*, নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজ বার্ষিকী, পশ্চিমগাঁও, কুমিল্লা, ১৯৭৮-৭৯, পৃ. ৫৩
৩৩. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২৬
৩৪. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬
৩৫. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪
৩৬. পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*
৩৭. আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশীদের (৭৮৬-৮০৯) স্ত্রী বেগম জুবায়দা কর্তৃক মক্কায় হজ্জ যাত্রীদের পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে খননকৃত খাল "নহরে জুবায়দা" নামে পরিচিত।
৩৮. ইতোপূর্বে আরো দু'জন বাঙালি মুসলিম নারী সাহিত্যিকের নাম ও তাঁদের রচিত সাহিত্য সম্পর্কে জানা গেলেও, সকল দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণে ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী সাহিত্যিক হিসেবে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮
৩৯. পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*
৪০. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal 1884-1912* (Dhaka: University Press Limited, 1974), p. 248
৪১. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩৬
৪২. ওয়াকিল আহমদ, "বাংলার বিদ্যৎ সভা : ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৭ম সংখ্যা, জুন, ১৯৭৮, পৃ. ১২৫
৪৩. *The Moslem Chronicle,* 16 May, 1896, p. 222; *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ৩৪ বর্ষ, ৩৮৭ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭, পৃ. ২৯৮
৪৪. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ৪৭৭ সংখ্যা, মে-জুন, ১৯০৩, পৃ. ৬-৮
৪৫. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর প্রকাশন, ২০০৬), পৃ. ২৪৪
৪৬. পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*